বঙ্গবন্ধুর জ্বালানি দর্শন ও বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা

মোল্লাহ আমজাদ হোসেন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে যে কাজ শুরু করেছিলেন পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফেরার পর থেকেই। বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্য পূরণে সকল ক্ষেত্রে নিজস্ব সম্পদ ও জনবল ব্যবহারকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান চালিকা জ্বালানিখাতকে দিয়েছিলেন সর্বোচ্চ গুরুত্ব। কার্যত জ্বালানিখাত বিশেষ করে গ্যাসখাত উন্নয়নের যে ধারা সূচনা করেছিলেন, তার উপর নির্ভর করেই বাংলাদেশ শিল্পায়নের আজকের পর্যায়ে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর থেকে সরকারসমূহ তার রেখে যাওয়া পথ পুরোপুরি অনুসরণ করতে না পারার কারণে দেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎখাত আজকের অচলাবস্থার মধ্যে পড়েছে। আত্মনির্ভর জ্বালানিখাত হয়ে উঠেছে আমদানিনির্ভর। যা বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। ফলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি অর্থনীতিকে নতুন চাপের মধ্যে ফেলেছে। চাহিদার জ্বালানি বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে না পারার কারণে বিঘ্নিত হচ্ছে নতুন নতুন শিল্পায়ন, ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে শিল্পউৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য। জ্বালানিখাতের দায় মেটাতে গিয়ে বাংলাদেশ এখন বড় ধরনের আর্থিক চাপের মুখে পড়েছে।

এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রতি বছরের মতো এবারও আগামী ৯ আগস্ট পালিত হচ্ছে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস। বিদেশি কোম্পানির কাছ থেকে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র কিনে নেওয়ার মধ্য দিয়ে দেশে গ্যাসনির্ভর যে জ্বালানিনিরাপত্তার গোড়াপত্তন হয়েছিল তা স্বরণীয় করে রাখতেই পালন করা হচ্ছে দিবসটি। ১২.৫ ট্রিলিয়ন ঘন ফুট মজুদের এই ৫টি গ্যাসক্ষেত্রে তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, রশিদপুর, কৈলাসটিলাসহ তিতাস বিতরণ কোম্পানির শেয়ার আন্তর্জাতিক কোম্পানি শেল-এর কাজ থেকে মাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ডে কিনে নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। টাকায় যার পরিমাণ ছিল ১৭ থেকে ১৮ কোটি টাকা। আর বাংলাদেশ সমান ৯ কিস্তিতে সাড়ে চার বছর সময় ধরে শেল'কে এই অর্থ পরিশোধ করেছিল। এই গ্যাসক্ষেত্রগুলো থেকে এখনো দেশের মোট উৎপাদনের ৩০ শতাংশের বেশি গ্যাসের জোগান আসছে।

গ্যাসক্ষেত্র কিনে নেওয়ার বিষয়টি এখন খুব স্বাভাবিক বিষয় মনে হলেও বন্ধুরাষ্ট্র নেদারল্যান্ডের কোম্পানি শেল বিভিকে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র বাংলাদেশের কাছে বিক্রি করাতে রাজি করানো খুব সহজ ছিল না। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে পা রেখেই বঙ্গবন্ধু দেশ পুনর্গঠনের পাশাপাশি জ্বালানিখাত নিয়ে কৌশলী পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছিলেন। মাত্র সাড়ে তিন বছর সময়কালে তিনি জ্বালানিসম্পদের উপর জনগণের মালিকা প্রতিষ্ঠা, বিদ্যুৎ পাওয়াকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে যুক্ত করা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাতের জন্য তিনটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ ওয়েল-গ্যাস কর্পোরেশন (আজকের পেট্রোবাংলা) এবং বাংলাদেশ মিনারালস ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠান করেন। অগ্রাধিকার বিবেচনায় তিন প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সচিবের মর্যাদা দিয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সাথে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেন। প্রণয়ন করেন বাংলাদেশ সমুদ্র সীমানা আইন, যার লক্ষ্য ছিল বঙ্গোপসাগরে তেল অনুসন্ধানের কাজ শুরু করা। স্বল্পতম সময়ে ইন্দোনেশিয়ার আদলে প্রণয়ন করা হয় মডেল উৎপাদন বণ্টন চুক্তি (এমপিএসসি)। তার আলোকে দরপত্র আহ্বান করে বিপুল সাড়া পাওয়া যায় এবং সাগরে তেল অনুসন্ধানে ৬টি পিএসসিও স্বাক্ষর হয়। প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পাশাপাশি তিনি দক্ষ জনবলও গড়ে তোলার কাজে হাত দেন। ১৯৭৩ সালের আরব ইসরাইল যুদ্ধের কারণে জ্বালানি স্বনির্ভরতা অর্জনে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে বঙ্গবন্ধু উৎসাহিত হয়েছিলেন। তার ফলে তিনি ১৯৭৫ সালে ৯ আগস্ট মাত্র সাড়ে ৪ মিলিয়ন পাউন্ড দামে শেলের কাছ থেকে তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, রশিদপুর ও কৈলাসটিলা গ্যাসক্ষেত্র এবং তিতাস গ্যাস বিতরণ কর্তপক্ষের শেয়ার কিনে নেন। যা এখনো দেশের গ্যাস সরবরাহে ভিত্তি হয়ে আছে। অবশ্য বলে রাখা দরকার যে, এবার জ্বালানি দিবস উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে জ্বালানি ও বিদ্যুৎখাতের বকেয়া প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার। বিদ্যুৎ এবং জ্বালানিখাত অব্যাহতভাবে লোকসান করছে। বারবার দাম বৃদ্ধি করেও তা সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। গত অর্থবছরে জ্বালানি ও বিদ্যুৎখাতে সাবসিডির পরিমাণ ছিল জিডিপির ১ শতাংশ। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা আশংকা করছেন চলতি অর্থবছরে তা দ্বিগুণ হতে পারে।

কিন্তু স্বনির্ভরতা থেকে বাংলাদেশ কেন জ্বালানি আমদানিনির্ভর হয়ে পড়েছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরের সরকারসমূহ তাঁর জ্বালানি দর্শনের উল্টো পথে হেঁটেছে। সেখানে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে, জনবল দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয় হয়ে উঠেছে অপ্রয়োজনীয়। নিজস্ব সম্পদ কয়লা, গ্যাস অনুসন্ধান এবং উত্তোলনের বিষয়টি সবচেয়ে কম গুরুত্ব পেয়েছে। বিদ্যুৎ জ্বালানিখাত হয়ে পড়েছে স্থানীয় এজেন্ট-ব্রোকার প্রভাবিত। বঙ্গবন্ধুর সময়কালে বঙ্গোপসাগরে তেল অনুসন্ধান দরপত্রের লোকাল এজেন্ট রাখার বিষয়টি নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যাকাণ্ডের পর খন্দকার মুশতাক প্রথম পেট্রোবাংলার অঙ্গহানি করতে শুরু করেন। জেনারেল জিয়া ক্ষমতা দখলের পর গ্যাস অনুসন্ধানে কিছু কাজ করা হলেও কার্যত প্রতিষ্ঠান ও দক্ষ জনবল ধ্বংসের ধারা অব্যাহত থাকে। জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখলের পর বিদ্যুৎ এবং জ্বালানিখাতে সৃষ্টি হয় লুটপাট আর নৈরাজ্যকর অবস্থা। অবশ্য ১৯৯১ সাল থেকে দেশ আবার গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরলেও এখন পর্যন্ত আর বঙ্গবন্ধুর জ্বালানি দর্শন অনুসরণ করা হচ্ছে তা বলা যাবে না। বুয়েটের ডিন প্রফেসর ড. এম তামিম মনে করেন, নিজস্ব গ্যাস অনুসন্ধান জোরদার করে নতুন মজুদ প্রাপ্তি এবং নিজস্ব কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার করা হলে আমদানিনির্ভরতা কমানো সম্ভব। এখন আমদানি থেকে পুরোটা বেরিয়ে আসার সুযোগ আর নেই।

তবে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এমপির দাবি, আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর জ্বালানি দর্শন থেকে সরে এসেছে এই অভিযোগ অযৌক্তিক। কেননা বঙ্গবন্ধুর পথ ধরে তাঁর কন্যা ১০০ ভাগ মানুষের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করেছেন। অব্যাহত চাহিদা বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনায় রেখেই জ্বালানি আমদানির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটা প্রেসার গ্রুপের

কারণে নয়। মনে রাখতে হবে, দেশে এত বেশি জ্বালানি মজুদ নেই যা দিয়ে পুরো চাহিদা মেটানো যাবে। বরং বঙ্গবন্ধুর দর্শন অনুসরণ করেই সামরিক শাসনামালে জ্বালানিখাতে যে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে পুরোটা বেরিয়ে আসার চেষ্টা অব্যাহত আছে।

বাংলাদেশের জ্বালানিখাত মুখ্যত গ্যাসনির্ভর। বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে শিল্প উৎপাদন, ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ থেকে যানবাহন চালানো সব কিছু ছিল গ্যাসনির্ভর। আবার ২০০০ সাল পর্যন্ত ব্যবহারের তুলনায় গ্যাসের মজুদ ছিল আকর্ষণীয়। কিন্তু পরের দশকগুলোতে গ্যাসের ব্যবহার বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় সরবরাহে টান পড়ে। গ্যাস সংকটের বিষয়টি প্রথম প্রকাশ্যে আসে ২০০৮ সালে যখন চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিল্পে গ্যাস সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়। অবশ্য পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রমাণিত মজুদ থেকে নিজস্ব উৎপাদন বাড়িয়ে ২০১৬ সালে প্রতিদিন ২৭০০ মিলিয়ন ঘনফুটের উপরে নেওয়া হলেও পরের বছর থেকে তা কমতে শুরু করে। এখন নিজস্ব উৎপাদন ২২৫০ এমএমসিএফডি। যদিও এখন গ্যাস চাহিদা ৪০০০ এমএমসিএফডি। এখন মজুদ যা আছে তা বড় জোর ৯ বছর চলতে পারে। অবশ্য ঘাটতি মেটাতে ২০১৮ সাল থেকে শুরু করা হয়েছে এলএনজি আমদানি। বর্তমানে এলএনজি আমদানির অবকাঠামো সক্ষমতা ১০০০ এমএমসিএফডি। আরো ২টি এফএসআরইউ স্থাপনের মাধ্যমে আমদানি অবকাঠামো সক্ষমতা ২০২৬ সালের মধ্যে ২৫০০ এমএমসিএফডিতে নেওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। আবার স্থলভাগে একটি এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের কাজ চলমান আছে। সবকিছু ঠিক থাকলে তা ২০২৮ সাল নাগাদ কার্যক্রম শুরু করতে সক্ষম হবে। আবার ২৪ সালের মধ্যে নিজস্ব উৎপাদন ৬১৮ এমএমসিএফডি বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। তাতে হয়তো নিজস্ব উৎপাদন সক্ষমতা আজকের পর্যায়ে ধরে রাখা সম্ভব হবে। ফলে চাহিদা মেটাতে এলএনজি আমদানি নির্ভরতার কোনো বিকল্প নেই।

আসলে ২০০০ সাল থেকে প্রায় ২৩ বছর সময়কালে নিজস্ব মজুদ থেকে ১৫ টিসিএফ গ্যাস ব্যবহার করা হলেও এর বিপরীতে নতুন মজুদ যোগ হয়েছে কম বেশি ৩ টিসিএফ। বর্তমানে প্রতি বছর ১ টিসিএফ গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে। চাহিদার পুরো জোগান দেওয়া সম্ভব হলে এর পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাবে। আজকের পরিস্থিতির মুখ্য কারণ হচ্ছে এই সময়কালে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কাজে অব্যাহত অবহেলা। স্থলভাগে অনুসন্ধানে একক বাপেক্স নির্ভরতা এবং বঙ্গোপসাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে যথাযথ নীতি গ্রহণে ব্যর্থতা। ফলে মায়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির পরও গত ৮ বছরের বেশি সময়ে কার্যকর কোনো বিনিয়োগ আসেনি। ২০১২ সাল থেকে ২০১৮ পর্যন্ত কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আসলেও ভারতের ওএনজিসি ছাড়া সরকারের আর্থিক প্যাকেজ আকর্ষণীয় নয় বিবেচনায় চলে যায়। অবশেষে সাগরের জন্য নতুন এমপিএসসি অনুমোদন করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, আগামী ২ মাসের মধ্যে দরপত্র আহ্বান করা হতে পারে। অবশ্য এবার গ্যাসের দাম ব্রেন্ট ক্রুড তেলের সাথে সম্পর্কিত করার কারণে আন্তর্জাতিক কোম্পানির অনেকেই বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছে। তাদের মধ্যে অগ্রণী অবস্থানে আছে বিশ্বের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান এক্সনমবিল। তারা দরপত্রে না গিয়ে আলোচনার মাধ্যমে গভীর সাগরের ১৫ ব্লকে বিনিয়োগের আগ্রহী দেখিয়ে নেগোসিয়েশন শুরুর জন্য সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষর করতে চেয়েছে। অবশ্য সরকার এখন বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। ফলে নানা কারণে বঙ্গবন্ধু এই অঞ্চলের সবার আগে বঙ্গোপসাগরে তেল গ্যাস অনুসন্ধান শুরু করলেও এখন বাংলাদেশ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পেছনে। সার্বিক বিচারে মনে হচ্ছে, সাগর এবং স্থলভাগে ব্যাপকভিত্তিক অনুসন্ধান শুরু করা সম্ভব না হলে গ্যাসখাতের আমদানি নির্ভরতা আরো বৃদ্ধি পাবে। যার ব্যয় মেটানো সরকারের পক্ষে সহজ না-ও হতে পারে।

দেশে প্রায় ৭৬ টিসিএফ গ্যাসের সমপরিমাণ জ্বালানি ভ্যালুর কয়লা মজুদ আছে। কিন্তু আর্থসামাজিক করিগরি সমীক্ষা না করেই কয়লা উঠানোর বিপক্ষে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে অনড় আছে সরকার। ৫টি কয়লা ক্ষেত্রের মধ্যে ৩টি নিয়ে বিস্তর সমীক্ষা আছে। দরকার আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞকে দিয়ে তার নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করে কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার করা। কেবল একটি মাত্র সিদ্ধান্ত সরকারের জ্বালানি আমদানির দায় তিন বছরের মধ্যে বহুলাংশে কমিয়ে আনতে সক্ষম হবে।

বঙ্গবন্ধু ঘোষিত পথ অনুসরণ করে মুজিববর্ষে সরকার ১০০ ভাগ বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করেছে। কিন্তু সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন এবং দাম সহনীয় রাখা সম্ভব হয়নি। কেননা দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গিয়ে অতিরিক্ত তেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং তা পুরোপুরি ব্যবহার করতে না পারার কারণে ক্যাপাসিটি চার্জ বড় সংকট হয়ে ওঠেছে।

সার্বিক বিবেচনায় নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দর্শন থেকে দেশ এখন অনেক দূরে। প্রবাহমান পরিকল্পনায় নিজস্ব জ্বালানি ব্যবহারের অগ্রাধিকার অনুপস্থিত। আবার ৪৫ বছরে জ্বালানিখাতের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা কমতে কমতে তলানিতে এসে পৌঁছেছে। তাই চাইলেও ঘুরে দাঁড়ানো খুব সহজ হবে না। এটা সত্য যে বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ বর্তমান চাহিদার পুরোটা জোগান দিতে পারবে না। কিন্তু আমদানির পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করে অর্থনীতির উপর চাপ কমানোর সুযোগ আমাদের আছে।

সোনার বাংলা গড়ে তোলার প্রত্যয়ে কৃষি থেকে শিল্পনির্ভর অর্থনীতিতে আসার জন্য নিজস্ব জ্বালানির পরিকল্পিত ব্যবহারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যার কারণে নিজস্ব তেল, গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধান ও ব্যবহারের সকল প্রস্তুতিই চূড়ান্ত করেছিলন মাত্র সাড়ে ৩ বছরে। কিন্তু তার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তাঁর দর্শনের যবনিকাপাত হয়। যা অব্যাহত ছিল পুরো সামরিক শাসন ও সামরিক শাসন থেকে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক দলের শাসনকালে। কার্যত ১৯৯১ সালে দেশ নির্বাচিত সরকার পেলেও জ্বালানি-বিদ্যুৎখাত উন্নয়নে দেশবান্ধব নীতি পায়নি। কিন্তু ১৯৯৬ সাল বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দায়িত্ব নেওয়া সরকার বঙ্গবন্ধুর পথে জ্বালানি-বিদ্যুৎখাত উন্নয়নের চেষ্টা শুরু করেন। এই সময়কালে কার্যত বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাতের উন্নয়ন ছিল সুসমন্বিত। বিদ্যুৎখাতে বেসরকারি বিনিয়োগ নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিজস্ব গ্যাস ও কয়লা উন্নয়ন উদ্যোগ ছিল প্রশংসনীয়। কিন্তু বলতে বাধা নেই, বিগত ১৫ বছর আওয়ামী লীগ তা ধরে রাখতে পারেনি। ফলে জ্বালানি ও বিদ্যুতের আমদানিনির্ভরতা এখন ৬০ শতাংশ। যার অপরিহার্য পরিণতি হিসেবে বিদ্যুৎ, গ্যাস, তেলসহ সকল জ্বালানির দাম বেড়েছে। তারপরও এই খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর অব্যাহত লোকসানের লাগাম টানা যায়নি। সাবসিডি বাড়ানোর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি জ্বালানি আমদানির ডলার জোগান না দিতে পেরে ১০০ ভাগ কাভারেজের পরও মানুষকে অন্ধকারে রাখতে হয়েছে। সর্বপরি শিল্পায়নের জন্য চাহিদা মতো জ্বালানি সরবরাহ দেওয়া নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে বিগত ১০ দশকে নতুন নতুন শিল্পায়ন খুব বেশি হয়েছে বা এফডিআই অনেক বেশি এসেছে এমনটি বলা যাবে না। অথচ মধ্য আয়ের দেশে গ্র্যাজুয়েশন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে যাওয়ার জন্য শিল্পায়নের কোনো বিকল্প নেই। যার জন্য দরকার অপরাপর দেশের মতো প্রতিযোগিতামূলক দামে জ্বালানি বিদ্যুৎ সরবরাহ। কিন্তু আমদানি করে কি তা সম্ভব?

তাই এবারের জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবসে সরকারের সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার হওয়া উচিত নিজস্ব গ্যাস, কয়লা ও নবায়নযোগ্য উৎস ব্যবহার করে আমদানিনির্ভরতা কমানো। অবশ্য পরিবর্তিত বিশ্বপ্রেক্ষপটে একক উৎস দিয়ে আর জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে না। কিন্তু নিজস্ব সম্পদের বিশেষ করে নিজস্ব জ্বালানিসম্পদ পরিকল্পিত উন্নয়নে ব্যবহার না করা হবে জাতি হিসেবে আত্মহত্যার শামিল। এবার আমাদের স্লোগান হোক 'বঙ্গবন্ধুর পথ ধরো, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করো'।